বাংলা অলংকার

রূপ ও স্বরূপ

অধ্যাপক মিহির চৌধুরী কামিল্যা

এম.এ., পি. এইচ. ডি, ডি. লিট.

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

কো-অডিনেটর, ডি. এস. এ. (বাংলা), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

কো-অডিনেটর, করেসপন্‌ডেনস কোর্স, বাংলা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

ড. সান্ত্বনা চক্রবর্তী

বাংলা বিভাগ

সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

অলংকার সম্পর্কে আমার আগ্রহ দীর্ঘদিনের। ১৯৬৬ সালে, অনার্সে পড়বার সময়ই রীতিমতো তর্ক তুলেছিলাম। চিঠি লিখেছিলাম তখনকার শ্রেষ্ঠ আলংকারিক অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীকে। অসুস্থ আচার্যের সস্নেহ উত্তরে আপ্লুত হয়েছিলাম। খুশি হয়েছিলেন আমার পূজনীয় অধ্যক্ষ-অধ্যাপকেরা। আজ তিনদশক পরে সেই অলংকারের বই লিখতে গিয়ে ঘটনাটি বারবার জেগে উঠছে।

ছাত্রাবস্থায় যেমন ভেবেছিলাম, অধ্যাপক হয়ে যেমন করে পড়িয়েছিলাম, কাব্যসভায় যেমন করে বিচার করে চলেছি, ঠিক তেমনি করেই 'বাংলা অলংকার ঃ রূপ ও স্বরূপ' লেখা। না—কোনো 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' নিয়ে এ-বই নয়, মৌলিক গবেষণাও নয়, সংস্কৃত অলংকারের ধূম্রাচ্ছাদিত জটিল জটাজালে আবহ নির্মাণও নয়— এ-বই সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষার্থীর জন্যেই লেখা—অলংকার পড়তে যাদের ভালো লাগে না, তাদের জন্যেই লেখা; বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈতরণী পার হতে যারা পা ফেলেছে, তাদের জন্যেই লেখা; নবীন প্রবীণ কবিদের কাব্যবিচার করতে যারা উৎসুক, তাদের হাতের কাছে রাখার জন্যেই লেখা। আর সেজন্যেই খুব দরকারী অলংকারগুলিকে বেছে নিয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের নির্দেশ জেনে নিয়ে, আমি বাংলা অলংকারের বহির্গঠন ও অন্তঃ সম্পদ উদঘাটন করেছি—ঠিক ক্লাশে যেমন পড়াই, সেই ক্লাশ রীতিতেই আলোচনা করেছি—খুব সহজভাবে, সরলভাষায়, বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও অসংখ্য উদাহরণে। এছাড়া পৃথক একটি অধ্যায়ে বিভিন্ন অলংকারের মধ্যে যে-সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, নানাদিক থেকে সে পার্থক্য তুলে ধরেছি। লক্ষ্য রেখেছি, কোথায় কেমন করে আলোচনা করলে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারবে, ঠিক আমার ছাত্রাবস্থার মতোই দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠবে।

১৯৮০ সালে, এ বই লেখার প্রথম তাগিদ দেন যশস্বী কবি অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ও বাঁকুড়ার বিশিষ্ট প্রকাশনা 'ভ্রাতৃসংঘে'র বিদ্যোৎসাহী কর্ণধার আশিস মুখোপাধ্যায়। তারপর নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে আসছিলেন অধ্যাপক ব্রহ্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রত্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক তপনকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রভাত ঘোষ, অধ্যাপক তপন গোস্বামী, অধ্যাপক স্বরূপ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শক্তিমান সিংহরায়, অধ্যাপক তুষার পণ্ডিত, অধ্যাপক আশীষ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। সাহায্যকারী গ্রন্থপ্রদান করেছেন অধ্যাপক বিজন চক্রবর্তী ও অধ্যাপক ধনঞ্জয় ঘোষাল। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন অনিমেষ মণ্ডল। এঁদের সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা সাহিত্যের বিচিত্ররসের আয়োজক আমার 'ছন্দ' গ্রন্থের শক্তিমান প্রকাশক শ্রীমান সন্দীপ নায়ক দ্রুত হাতে এ-বই প্রকাশ করলেন—প্রকাশন সাম্রাজ্যে তাঁর সুচির প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

১লা বৈশাখ ▮ ১৪০৩

মিহির চৌধুরী কামিল্যা

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ঃ অলংকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ১১-১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শব্দালংকার ১৪-৩৯

।১। অলংকারের শ্রেণীবিভাগ ১৪-১৫

।২। শব্দালংকার—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য প্রকারভেদ ১৫-১৬

১. অনুপ্রাস ঃ সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ—অন্ত্যানুপ্রাস
বৃত্ত্যনুপ্রাস ছেকানুপ্রাস শ্রুত্যনুপ্রাস লাটানুপ্রাস ১৭-২২

২. যমক ঃ সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ—আদ্যযমক
মধ্যযমক অন্ত্যযমক সর্বযমক
যমকে সার্থক-নিরর্থক শব্দ ২২-২৯

৩. শ্লেষ ঃ সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ—অভঙ্গ সভঙ্গ ২৯-৩৫

৪. বক্রোক্তি ঃ সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ—কাকুবক্রোক্তি শ্লেষবক্রোক্তি ৩৫-৩৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাদৃশ্যমূলক অলংকার ৪০-১০৫

।১। অর্থালংকার—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভাগ ৪০-৪২

।২। সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভাগ ৪২-৪৪

১. উপমা—সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা, স্মরণোপমা, ৪৪-৫৫

২. রূপক—সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ—নিরঙ্গ, কেবলনিরঙ্গ, মালানিরঙ্গ, সাঙ্গ পরম্পরিত, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক ৫৫-৬৬

৩. উৎপ্রেক্ষা—সংজ্ঞা প্রকারভেদ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা
প্রতীয়মান-উৎপ্রেক্ষা ৬৭-৭৪

৪. সন্দেহ—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ৭৪-৭৫

৫. ভ্রান্তিমান—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ৭৬-৭৭

৬. নিশ্চয়—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ৭৮-৮১

৭. অপহ্নুতি—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ৮১-৮৪

বিষয় পৃষ্ঠা

৮. ব্যতিরেক—সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ—উৎকর্ষাত্মক অপকর্ষাত্মক
বৈশিষ্ট্য ৮৪-৮৮
৯. সমাসোক্তি—সংজ্ঞা ৮৮-৯১
১০. অতিশয়োক্তি—সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ ভেদে-অভেদ
অভেদে-ভেদ সম্বন্ধেঅসম্বন্ধ
অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কার্যকারণের পৌর্বাপর্যবিপর্যয় ৯১-৯৭
১১. প্রতিবস্তুপমা—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ৯৭-১০০
১২. দৃষ্টান্ত—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১০০-১০৩
১৩. নিদর্শনা—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১০৩-১০৫

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিরোধমূলক অলংকার ১০৬-১১৭

।১। বিরোধমূলক অর্থালংকার—সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভাগ ১০৬-১০৭
১. বিরোধাভাস— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১০৭-১১০
২. বিশেষোক্তি— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১১০-১১২
৩. বিভাবনা— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১১২-১১৪
৪. অসঙ্গতি— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১১৪-১১৫
৫. বিষম— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১১৬-১১৭

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার ১১৮-১২৫

।১। গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার—সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ
১. ব্যাজস্তুতি— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১১৮-১২০
২. অপ্রস্তুতপ্রশংসা— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১২০-১২২
৩. অর্থান্তরন্যাস— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১২৩-১২৫
৪. স্বভাবোক্তি— সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ অলংকারের তুলনামূলক আলোচনা ১২৬-১৪২

১. অনুপ্রাস-যমক ১২৬
২. সন্দেহ-উৎপ্রেক্ষা ১২৭
৩. উৎপ্রেক্ষা-অপহ্নুতি ১২৮
৪. অতিশয়োক্তি-ব্যতিরেক ১২৯
৫. সমাসোক্তি-রূপক ১৩০
৬. অসঙ্গতি-বিশেষোক্তি ১৩১
৭. অপহ্নুতি-নিশ্চয় ১৩২
৮. অসঙ্গতি-বিষম ১৩৩
৯. সন্দেহ-ভ্রান্তিমান ১৩৪
১০. উপমা-রূপক ১৩৪

বিষয় পৃষ্ঠা

১১. ব্যতিরেক-সমাসোক্তি ১৩৫
১২. বিরোধাভাস-বিশেষোক্তি ১৩৬
১৩. উৎপ্রেক্ষা-ভ্রান্তিমান ১৩৭
১৪. শ্লেষ-যমক ১৩৭
১৫. অপহ্নুতি-অতিশয়োক্তি ১৩৮
১৬. লুপ্তোপমা-অতিশয়োক্তি ১৩৯
১৭. সাঙ্গরূপক-পরম্পরিতরূপক ১৩৯
১৮. রূপক-অতিশয়োক্তি ১৪০
১৯. অতিশয়োক্তি-উৎপ্রেক্ষা ১৪১
২০. শ্লেষ-শ্লেষবক্রোক্তি ১৪২

সপ্তম অধ্যায় ঃ অলংকার নির্ণয় ঃ পদ্ধতি ও প্রকরণ ১৪৩-১৫১

১. অলংকার নির্ণয় কী ১৪৩
২. তার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা কী ১৪৩
৩. অলংকার নির্ণয়ের পূর্বসূত্র ১৪৩
৪. কাব্যাংশের অলংকার নির্ণয়—উদাহরণ সমাবেশ (১-২১টি) ১৪৪-১৫১

একনজরে বাংলা অলংকার ১৫২-১৭৬

সিলেবাস ১৭৭-১৭৮

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ১৭৯-২২৪

প্রথম অধ্যায়

অলংকার ঃ সংজ্ঞা ও স্বরূপ

- ☐ কাব্যংগ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ—বামন।
- ☐ আলতাপায়ে চালতা পায়ে পদ্মকলি মুখটি তার।
  এমন গয়না পরাই দিব চোখ ফিরাতে লারবি আর।। — টুসুগান
- ☐ কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর করে,—মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়,—প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে—বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে,—বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়।— রবীন্দ্রনাথ

১. অলংকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

কাব্যদেহের যে-সমস্ত উপাদান কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ও পাঠককে রসের উৎকর্ষ দেয়, তাকে বলে 'অলংকার'।[১]

'অলংকার' মানে গয়না। যা 'অলম্' বা ভূষিত করে, তা-ই অলংকার। অর্থাৎ অলংকার হলো সেই জিনিস—যা অন্য কোনো জিনিসকে ভূষিত করে, সুন্দর করে, আকর্ষণীয় করে, নয়নলোভন করে।

এই যেমন — এখন যে-মেয়েটি আমাদের সামনে বসে আছে সাধারণ শাড়ি পরে,—ওকে এখন একরকম দেখাচ্ছে, সাধারণ-ই দেখাচ্ছে। কিন্তু বিবাহ উৎসবে ও যখন হার, দুল, বালা, নোলক, মল, লটকন, সিঁথি ইত্যাদি গয়না পরে, ঝলমলে পোষাক পরে, সুগন্ধী মেখে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন—এই 'সাধারণ মেয়েটি'কেই ভারি সুন্দর দেখাবে। তাহলে এটা তো ঠিক, অলংকার পরলেই সাধারণ মানুষকেও সুন্দর দেখায়, তার সৌন্দর্য আমাদের আকর্ষণ করে। ভামহ ঠিকই বলেছিলেন ঃ 'বনিতার মুখ মনোহর হলেও বিনা অলংকারে তা দীপ্তি পায় না।'

তেমনি, সাধারণ কথাকে অলংকার পরালে, তাও সুন্দর হয়ে ওঠে। সাধারণ কাব্যকে অলংকারে সাজালে, তাও সুন্দর হয়। মানুষের অলংকারের নানা নাম আছে। হার, দুল, বালা, চুড়ি প্রভৃতি—তেমনি কাব্যের অলংকারেরও নানা নাম—অনুপ্রাস উপমা, শ্লেষ যমক বক্রোক্তি রূপক প্রভৃতি। এক একটি অলংকার আমাদের শরীরকে এক এক রকম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে, তেমনি কাব্যের এক একটি অলংকারও কাব্যকে এক এক রকম চমৎকারিত্ব দেয়। কবিরা এই সব অলংকারে নিজ নিজ কাব্যকে সাজান, সাধারণ কথাকে তাঁরা সুন্দর করে তোলেন।

---

১. অলংকার = অলম + কৃ + ঘঞ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'যা অত্যন্ত অনুভব করি, সেটা যে অবহেলার জিনিস নয়, এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।' এই 'কারুকাজ'-ই হলো কাব্যের অলংকার—কাব্যের সাজগোজ—'মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন করে সাজায় প্রিয়াকে'—কবিরাও ঠিক তেমনি যতক্ষণ না মনের মতো হয়, ততক্ষণ তাঁদের কাব্যকে সাজান। যেমন ঃ

'আমি সারা জগৎ গান গেয়ে বেড়াব।'

—এটি একটি সাধারণ কথা। কোনো কারুকার্য নেই। কোনো অলংকার নেই। সাধারণ মানুষ সাদামাঠা ভাবে নিজের মনের কথা যেমন করে বলে, এ-ও তেমনি। এতে আমরা ভাবটা বুঝছি,—কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছিনা, চমৎকৃত হচ্ছিনা। কিন্তু কবি যখন এই কথাটাই নানা অলংকারে সাজিয়ে বললেন—

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিব
আকুল পাগল পারা।"

—তখন, এই সাধারণ কথাটি আর সাধারণ থাকে না। কেমন যেন অপরূপ হয়ে ওঠে। আমাদের শুনতে ভালো লাগে, বলতে ভালো লাগে, কথাটা 'রসনা-রোচন' হয়, 'শ্রবণ বিলাস' হয়।

কিন্তু ওই সাধারণ কথাটায় কবি কী যোগ করলেন?—দেখছি,—'প্লাবিয়া' 'গাহিয়া'—এই দুই শব্দে ঝংকার তুললেন; 'আকুল পাগল' শব্দে রহস্য জাগালেন; আর 'আমার সারা জগৎ গান গেয়ে বেড়ানো'র স্পিরিটটাকে কবি আশ্চর্যভাবে বেগবান করে তুললেন—আমার বেড়ানোর সঙ্গে 'আকুল পাগলে'র একটি অপরূপ সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। ফলে কাব্যের সৌন্দর্যলোক নির্মিত হলে—'কাব্যের কল্পলতায় ফুল' ধরলো। আর অমনি কবির লেখাটি আমাদের মুগ্ধ করলো—শুনতে ভালো লাগলো, পড়তে ভালো লাগলো—এই হলো 'অলংকার'।

কিন্তু কবি যদি লিখতেন—

(ক) 'আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াই গেয়ে বিরাটপাগল পারা।'

কিংবা লিখতেন, (খ) 'আমি সারাটা জগৎ বেড়াই গাহিয়া আকুল খেপার পারা।'

—তখন সেটা আর আমাদের এমন ভাবে নাড়া দিত না। কেন না, এতে যে জিনিসটা কমে গেল, সেটাই ছিল 'অলংকার'। আর সেই 'অলংকার' নেই বলেই এই (ক) (খ) উদাহরণ দুটো আমাদের মন ও কানকে টানছে না। এজন্যেই তো কাব্যবিচারের এক পরম পণ্ডিত বামন বলেছিলেন—'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ' —'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ'—অর্থাৎ অলংকারই কাব্য—সৌন্দর্যই অলংকার।

কিন্তু কেমন অলংকার? কেমন সৌন্দর্য?—

না, কবি যখন বলেন—

'চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ'।

—তখন লক্ষ্য করি, কবি 'চ' ধ্বনিটিকে কেমন করে সাজাচ্ছেন—কী অপরূপ করে সাজিয়ে দিলেন, 'চ' দিয়ে যেন বৃত্ত রচনা করলেন—এবং তা শুনতে শুনতে কান পূর্ণ হয়ে গেল। মনে মনে কবিকে বাহবা না দিয়ে পারলাম না। এই হলো 'অলংকার'।

কিংবা কবি যখন বলেন ঃ

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্মদীপ্ত প্রভাত রশ্মি সম,
লও ছিঁড়ে লও বাসনা সঘন এ কালো নয়ন মম।

—তখন বুঝি, একটা সাধারণ 'ছুরি'কে কবি কী অপরূপই না করে তুলছেন—কেমন 'ছুরি'? না—'তীক্ষ্ম দীপ্ত' ছুরি, কেমন ছুরি? না, —'প্রভাত রশ্মির মতো তীক্ষ্ম দীপ্ত ছুরি'। অথচ আমরা তো এ রকমটা আগে ভাবতে পারি নি যে কবি একটা ছুরিকে এমন করে চারুত্বময় করে তুলবেন! ফলে কাব্যাংশটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পরম পরিতৃপ্তি ঘটলো এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিকে 'শিল্পী' বলে অভিনন্দিত করতেই হলো। এই হলো 'অলংকার'।

সুতরাং অলংকার হলো ঃ

১. কাব্যের ভূষণ।
২. তা কাব্যের বহিরঙ্গ ভূষণ হতে পারে, অন্তরঙ্গ ভূষণ হতে পারে।
৩. তা কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।
৪. তা পাঠককে কাব্য-রস দেয়—পাঠকের কান ও মনকে পরিতৃপ্ত করে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দালংকার

ছক-১ ঃ অলংকারের শ্রেণীবিভাগ

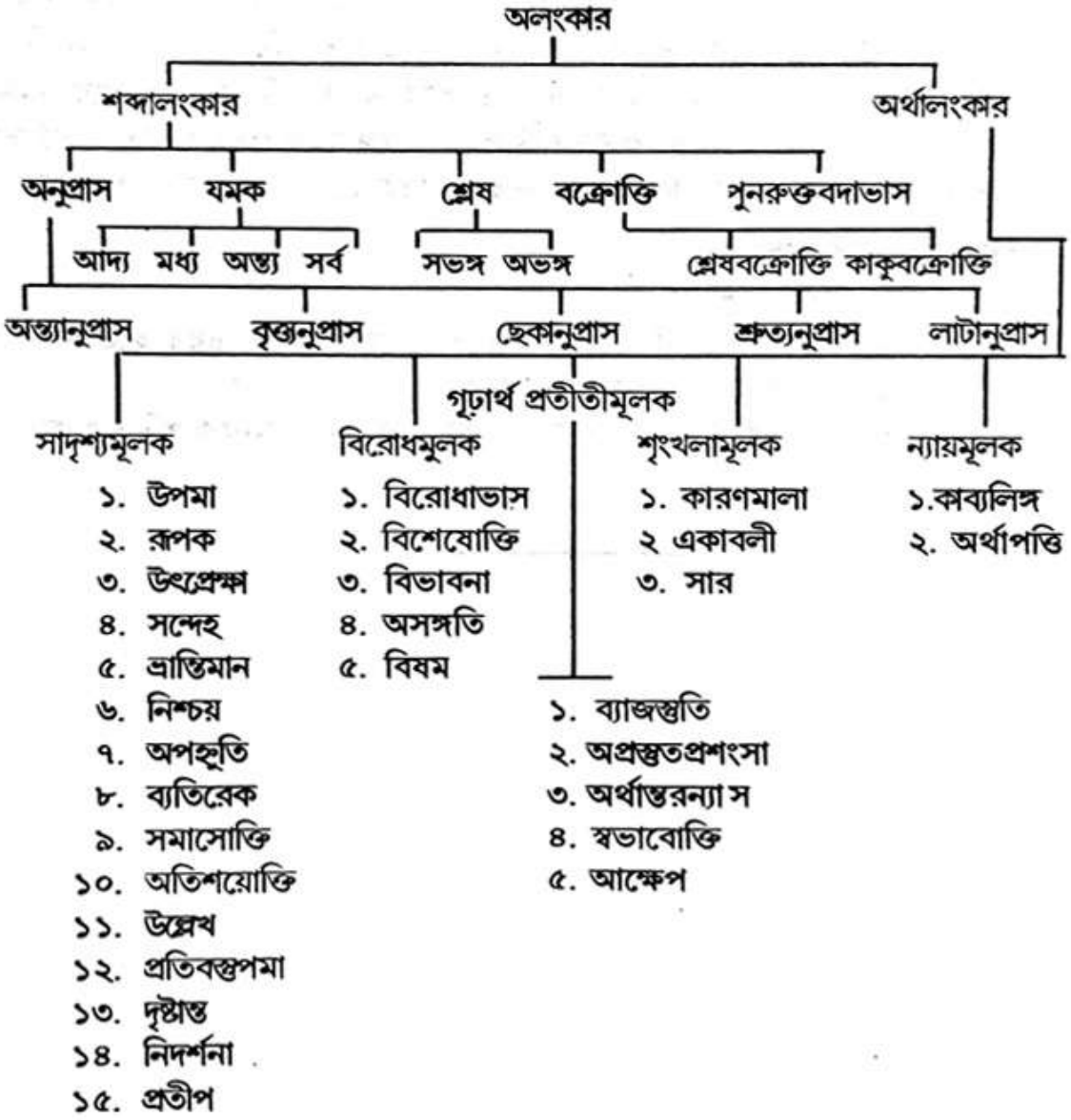

১. অলংকারের শ্রেণীবিভাগ

কাব্য পাঠের দুটি দিক ঃ

এক — ধ্বনি গত দিক বা শব্দ গত দিক। এ হলো কাব্যের ধ্বনি সাম্য বা শব্দ-ঝংকার যাতে কান তৃপ্ত হয়।

দুই — অর্থগত দিক। এ হলো কাব্যের অর্থের ব্যঞ্জনা, যাতে মন তৃপ্ত হয়।

'ধ্বনি ঝংকার' কাব্যের বহিরঙ্গ বা সাজসজ্জাগত অলংকার।

অর্থগত 'ব্যঞ্জনা' বা সৌন্দর্য, কাব্যের অন্তরঙ্গ বা অন্তর্নিহিত অলংকার।

এজন্যেই অলংকার দু রকম ঃ

(ক) শব্দালংকার—যা শব্দ বা ধ্বনি দিয়ে গড়ে উঠেছে।

(খ) অর্থালংকার—যা শব্দের অর্থ দিয়ে গড়ে উঠেছে॥

২. শব্দালংকার

২. (১) সংজ্ঞা ঃ শব্দের ধ্বনি সাম্যে (=ধ্বনি ঝংকারে) যে অলংকারের সৃষ্টি, তাকে 'শব্দালংকার' বলে।

যেমন ঃ আমি অজর অমর অক্ষয় আমি অব্যয়।

— এখানে কবি নজরুল 'বিদ্রোহী'র স্বরূপ প্রকাশ করছেন। সেই স্বরূপ প্রকাশে 'অ' ধ্বনিটিকে তিনি পরপর ৬ বার ব্যবহার করলেন। যাতে এক রকমের ধ্বনিসাম্য বা ধ্বনিঝংকার সৃষ্টি হলো। যা বিদ্রোহীর অসামান্য সত্তাটিকে প্রকটকরে তুললো।—এইভাবে এখানে কাব্যের সৌন্দর্য নির্মাণে শব্দ-ধ্বনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে—এবং এখানে অর্থ বড় হয় নি। ফলে কাব্যংশটি হয়ে উঠেছে একটি উৎকৃষ্ট 'শব্দালংকার'।

আরো কিছু উদাহরণ ঃ

১. চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ। — রবীন্দ্রনাথ

—এখানে 'চ'-ধ্বনির বারবার ৬ বার ব্যবহারে ধ্বনিসাম্য ঘটেছে। ফলে ধ্বনিঝংকার উঠেছে। তাই এখানে 'চ'-ধ্বনির সাম্যে একটি অভূতপূর্ব শব্দালংকার গড়ে উঠেছে। এটিও কাব্যের বহিরঙ্গ বা সাজসজ্জাগত অলংকার।

২. না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত।

—এখানে 'শাসন বসন বাসন অশন আসনে' অপরূপ ধ্বনি ঝংকার উঠেছে। সাম্য হয়েছে 'আসন' বা 'অসন' শব্দধ্বনিতে। এই সাম্য কাব্যের বাইরের সাজসজ্জাগত। তাই এটি শব্দালংকার।

৩. কোথা হাহন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি।

—এখানে হন্ত, সন্ত, সন্ত—নিয়ে অপরূপ ধ্বনি সাম্য গড়ে উঠেছে। আবার বসন্ত শব্দটি